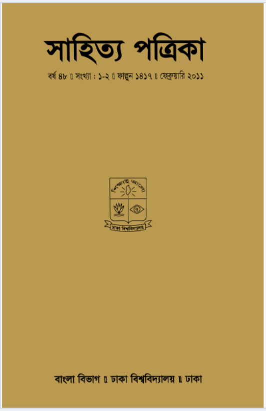

Vol. 48 | No. 1-2 | 2011

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

‘একটি তুলসীগাছের কাহিনী' পাঠের রকমফের পাঠবিবিধতার নন্দনতত্ত্ব

Volume	48
Issue	1-2
Year	2011
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Mohammad Azam
Published online	February 1, 2011
DOI	10.62328/sp.v48i1-2.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v48i1-2.3
Pages	৩৩-৫১
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলা বিভাগ ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

‘একটি তুলসীগাছের কাহিনী’ পাঠের রকমফের পাঠবিবিধতার নন্দনত

Check for updates

মোহাম্মদ আজম

‘একটি তুলসীগাছের কাহিনী’ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর সর্বাধিক পঠিত গল্পগুলোর একটি। এ নিবন্ধের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য, গল্পটি আবার নতুন করে পড়া। পড়ার সময় পুরনো পাঠগুলো গুরুত্বের সাথে পর্যালোচিত হয়েছে। নব্যসমালোচকদের মতো টেক্সটের সম্ভাব্য চিহ্নগুলোকে যথাসম্ভব আমলে আনা হয়েছে, অবলম্বিত হয়েছে যাকে পশ্চিমা সাহিত্যসমালোচকদের ভাষায় ক্লোজ রিডিং বা নিবিড় পাঠ বলা হয়, সে পাঠ-পদ্ধতি, যদিও নজর রাখা হয়েছে এ সত্যে যে, পাঠ কিছুতেই টেক্সটের সীমায় বদ্ধ থাকে না। ব্যবহৃত পুরনো পাঠগুলোর প্রায় সব কটির ক্ষেত্রে উত্থাপিত হয়েছে টেক্সটের প্রতি ‘অবিশ্বস্ত’ হওয়ার এবং প্রচলিত ধারণা টেক্সটে আরোপের অভিযোগ। তবু ওই পাঠগুলো গুরুত্বপূর্ণই থেকে গেছে; কারণ, বহুপাঠের সম্ভাবনা যাচাই করা এবং ভাষার যে সব বৈশিষ্ট্যের জন্য কোনো টেক্সট স্বভাবতই বহুপাঠসম্ভব হয়ে ওঠে — এ গল্প অবলম্বনে — সেগুলোর খোঁজখবর নেয়াও বর্তমান রচনার উদ্দেশ্য।

১.১

‘একটি তুলসীগাছের কাহিনী’ গল্পের ঘটনাংশ বেশ সংক্ষিপ্ত। এর কাহিনীকে মাঝারি আকারের এক অনুচ্ছেদেই আঁটিয়ে ফেলা সম্ভব। (আবদুল ২০০১ : ২৪)। কিন্তু প্লটের বিবেচনায় গল্পটাকে এত সরল বলা যাবে না। পৃষ্ঠা ছয়েকের[১] এ গল্প পরিকল্পিত ও কার্যকর ন্যারেটিভের এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। গল্পটি বলা হয়েছে লেখকের জবানিতে। লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকেই বর্ণনাংশ তৈরি হয়েছে। কিন্তু প্রতিটি অংশেই সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো নিজ নিজ হিস্যা বুঝে নেয়ায়, অর্থাৎ দৃষ্টিকোণের এক ধরনের গণতন্ত্রায়ণ হওয়ায়, লেখকের স্বর অন্য স্বরগুলোকে দমিয়ে দেয়নি। অবশ্য একক আধিপত্য না থাকলেও মোটের উপর লেখকের স্বরের আধিপত্যেই গল্পটি নিষ্পন্ন হয়েছে। কথাটা এভাবে বলা যায় : বিশেষ কোনো অংশে সংশ্লিষ্ট চরিত্র বা পক্ষের দৃষ্টিকোণ ‘যথাযথ বাস্তবতা’ তৈরির স্বার্থে আত্তীকৃত করে নিয়ে লেখক নিজ দায়িত্বে অংশগুলোর সমন্বয় করেছেন — যেন একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ন্যারেটিভ তৈরি হতে পারে। কীভাবে চরিত্রগুলো নির্মিত ও ব্যবহৃত হয়েছে তার একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা যাক।

এ গল্পের চরিত্রগুলো সামষ্টিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার অভিব্যক্তি তৈরি করে, যদিও তাদের অনেককেই ব্যক্তি হিসাবে চিনে নেয়া যায়। ব্যক্তিক বিশিষ্টতার সাথে সামষ্টিক সাধারণীকরণের দ্বন্দ্ব ছিল গল্পটির অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ। বলা দরকার, উল্লেখযোগ্য

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সাফল্যের সাথে ওয়ালীউল্লাহ দ্বন্দ্ব জিইয়ে রেখেই কাজটি হাসিল করতে পেরেছেন । অর্থাৎ ব্যক্তি হিসাবে চরিত্রগুলো ঠিক ততটাই বিশিষ্ট হয়েছে যতটা হলে সামষ্টিক আয়োজন ছাড়িয়ে ব্যক্তিগততা বড়ো হয়ে উঠবে না।

এ ধরনের ট্রিটমেন্ট আমরা লক্ষ করেছি *কাঁদো নদী কাঁদো* উপন্যাসে কুমুরডাঙার কাহিনীতে। নদীর কান্না শোনার ক্ষেত্রে সেখানে বহু মানুষকে সমরূপ করে তোলা হয়েছে, যদিও বর্ণিত মানুষদের প্রায় সবাই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে হাজির । সাহিত্যে চরিত্র ব্যাপারটি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সাথে এত বেশি পরিমাণে জড়িত যে, কাজটি মোটেই সহজ নয়। পরবর্তীকালে সৈয়দ শামসুল হক কোথাও কোথাও এবং শহিদুল জহির প্রায় সর্বত্র এক 'আমরা'র জবানিতে কাহিনী বর্ণনার কৌশল নিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের 'আমরা'র মধ্যে ব্যক্তি পুরোপুরি গরহাজির, আর 'আমরা'র ভূমিকা অনেকটা গ্রিক নাটকের কোরাসের মতো। বিপরীতে *কাঁদো নদী কাঁদোতে* যেমন, তেমনি একটি তুলসীগাছের কাহিনীতেও লেখক স্বয়ং বর্ণনাকারী, আর 'তারা' তৈরি হয় প্রায় নির্দিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তি সমবায়ে। এ বিচারে 'একটি তুলসীগাছের কাহিনী' গল্পের আয়োজন *কাঁদো নদী কাঁদো* উপন্যাসের চেয়েও দৃষ্টিগ্রাহ্য। কারণ অতি ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে এখানে কাজটি সম্পন্ন করতে হয়েছে।

'সে কথাই এরা ভাবে। বিশেষ করে মতিন।' গল্পের শুরুতে বাড়িটার সংক্ষিপ্ত বর্ণনার পরে এভাবে চরিত্রের বর্ণনায় প্রবেশ করেন লেখক। ব্যাপারটি কাকতালীয় কিংবা কেবল বর্ণনাভঙ্গির সুবিধার ব্যাপার নয় যে, প্রথমে সামষ্টিক 'এরা' এবং পরে ব্যক্তি মতিনের কথা বলা হল । অনুচ্ছেদটি শেষ করে পরের বাক্যে গিয়ে (অফিস থেকে শ্রান্ত হয়ে ফিরে প্রায় রাস্তা থেকেই চড়তে-থাকা দোতলায় যাবার সিঁড়ি ভাঙতে-ভাঙতে মতিনের মনে জাগে এসব কথা।) আমরা নিশ্চিত হই, এ ভাবনা মতিনেরই বটে। এবং মতিন যে এরূপভাবে — ভাবতে পারে — তার কারণ তার ব্যক্তিমনের বিশিষ্ট গড়ন ও ইতিহাস। আমরা পরে দেখব মতিনের এই বিশেষত্বকে লেখক গল্পের গুরুত্বপূর্ণ এক কাজে খাটিয়েছেন। কিন্তু মতিনকে তো সম্পূর্ণ ব্যক্তি রূপে ভাবতে দেয়া যায় না। সে কারণে 'এরা' দিয়ে বর্ণনার শুরু। একই কারণে মতিন এমনকি তার কল্পনায়ও 'হুকাসেবী আমজাদ' আর 'গল্পপ্রেমিক কাদের'কে সাথে নিয়ে নেয় । ফলে ব্যক্তিগত ভাবনার মধ্যে তৈরি হয় সামষ্টিকতার বোধ।

এই সামষ্টিকতার বোধ তৈরি হতে পারে, কারণ, আমজাদ আর কাদেরের সম্ভাব্য অসংখ্য বৈশিষ্ট্য থেকে এখানে বেছে নেয়া হয়েছে একটি করে, যেগুলো মতিনের বর্তমান কল্পনার প্যাটার্নের সাথে — অর্থাৎ, বাগান করার কল্পনার সাথে — খাপ খায়, আর সেই গণ্ডির মধ্যেই থাকে। কিন্তু মিতব্যয়ী ওয়ালীউল্লাহ কেবল সামষ্টিকতার বোধ তৈরির মধ্যেই বর্ণনাকে শেষ হতে দেন না। বরং এ দুজনের এই দুই বৈশিষ্ট্য দুটি চরিত্রকেই অন্তত আংশিকভাবে পরিচয় করিয়ে দেয়, তাদের পরবর্তীকালীন সংক্ষিপ্ত কিন্তু কার্যকর ভূমিকার সাথে যে পরিচয় সংগতিপূর্ণ।

এভাবে এ গল্পের আবহে সামষ্টিকতার বোধ এমনভাবে জারি রাখতে হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তিগত স্বর নিজ দৃষ্টিভঙ্গিসমেত বর্ণনাকারী হয়ে উঠবে — সে অবকাশ এখানে ছিল না।

সময়ের দিক থেকে গল্পের বর্ণনাটা শুরু হয়েছে মাঝামাঝি সময় থেকে। অর্থাৎ ঘটনা বর্ণনার সময়সীমা ঘটনা ঘটার কালপর্বের মোটামুটি অর্ধেক। ঘটনার শুরু বাড়ি-দখল দিয়ে, আর শেষ হয়েছে বাড়ি ছেড়ে যাওয়ায়। গল্প শুরু হয়েছে বাড়িটির বর্ণনা দিয়ে — মতিন অফিস থেকে ফিরছে, এমন এক মুহূর্তের ভাবনায়। তার মানে তারা তখন বাড়িতে গুছিয়ে বসেছে। আগের জরুরি অংশগুলো বলে নেয়া হয়েছে অনেকটা ফ্ল্যাশব্যাকের মতো করে। আগ-পরের ঘটনাগুলো অবশ্য বিশেষ কোনো জটিল অন্তর্বয়নে নির্মিত হয়নি। ঘটনাধারার দিক থেকে বা সময়ক্রমের দিক থেকে, বলা যায়, গল্পটি সরল। তবে নির্দিষ্ট সময়খণ্ডের উল্লেখ বা সময়ের ধারণার ব্যবহার গল্পটির সামগ্রিক অবয়বকে প্রভাবিত করেছে। চরিত্রগুলোর মানসিক অবস্থা ও পরিবর্তন বুঝে ওঠার জন্য সময়ের কিছু উল্লেখ প্রয়োজন ছিল। যেমন, '...তাদের ভুলটা ভাঙতে দেরি হয় না। তবে শুধু ততখানিই দেরি হয় যতখানি দরকার, সে বিশ্বাস দৃঢ় পরিণত হবার জন্য।' আবার তুলসীগাছ সংক্রান্ত বিবরণীর জন্যও দরকার ছিল ন্যূনতম দৈর্ঘ্যের সময়। বাড়িতে ওঠার কিছুদিন পর তারা তুলসীগাছটি দেখে। 'কয়েকদিন পর' মোদাব্বেরের নজরে পড়ে 'সতেজ হয়ে' ওঠা তুলসীগাছ। শেষে দিন দশেক যত্ন না পেয়ে 'তুলসীগাছটা আবার শুকিয়ে' ওঠে।

১.২

উপরে 'একটি তুলসীগাছের কাহিনী' গল্পের বর্ণনাশৈলীর দুটি দিকে আলোকপাত করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে বলা সম্ভব যে, এ গল্পে কাহিনী ও প্লটের মধ্যে উল্লেখ করার মতো পার্থক্য আছে। প্লটের খণ্ডাংশগুলো সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করলে বোঝা যায়, পরিকল্পিত বিন্যাসের ভিতর দিয়ে প্লট এমন এক কাঠামো লাভ করেছে, যা নিজের দিকে আমাদের চোখ ফেরাতে বাধ্য করে। বলা যায়, এ গল্পের কাহিনীর তুলনায় প্লট অনেক বেশি দৃষ্টিগ্রাহ্য ও তাৎপর্যপূর্ণ।

অন্যত্রও ওয়ালীউল্লাহ সাধারণভাবে গল্পকথক নন; অন্তত ইংরেজিতে যাকে story-telling বলা হয়, সে অর্থে।[২] অন্যভাবে বলা যায়, তিনি কথকতার মধ্য দিয়ে — চরিত্র ও ঘটনার মধ্য দিয়ে — কোনো বক্তব্যকে ফলিয়ে তোলেন না, বা উদ্দেশ্যকে গল্পের আড়ালে নিয়ে যান না। বরং নিজের প্রস্তাবকে স্থির রেখে প্রস্তাব বা উদ্দেশ্যের পক্ষে ঘটনাংশ বা বর্ণনাংশ তৈরি করেন। বর্তমান গল্পে এরকম অন্তত সাতটি ঘটনাংশ চিহ্নিত করা সম্ভব, যেগুলো আভ্যন্তর পারস্পরিকতায় যুক্ত থেকে প্লটের তাৎপর্যপূর্ণ সামগ্রিকতা তৈরি করেছে। অংশগুলোকে সংক্ষেপে এভাবে বর্ণনা করা যায় :

১) দেশভাগের সময় কলকাতা-ফেরত কয়েকজন একটি পরিত্যক্ত হিন্দুবাড়ি দখল করে।
২) ঘটনার তদারকিতে পুলিশ আসে; কিন্তু সম্ভবত আইনের স্পষ্টতার অভাবে তাদের বাড়ি ছাড়তে হয় না।
৩) তারা আশ্বস্ত হয় এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাবাদী হয়ে ওঠে।
৪) এ সময় রান্নাঘরের পেছনে একটি তুলসীগাছ তাদের নজরে আসে। প্রথমে উপড়ে ফেলতে চাইলেও পরে গাছটি অক্ষতদেহেই বিরাজ করতে থাকে।
৫) গোপন যত্ন পেয়ে তুলসীগাছটি সতেজ হয়ে ওঠে।

৬) আবার পুলিশ আসে, এবং তাদের বাড়িছাড়ার নোটিশ দেয়।
৭) যত্ন না পেয়ে তুলসীগাছটি ফের শুকিয়ে ওঠে।

আগেই বলেছি, এই সাতটি অংশ আভ্যন্তর পারম্পরিকতায় পরস্পরের সাথে যুক্ত — বাইরের সম্পর্কে নয়। অর্থাৎ, ঘটনা বা চরিত্রের ধারাবাহিকতায় একটি সরলরৈখিক ক্রমিকতা তৈরি হয়নি; বরং ঘটনাংশের তাৎপর্যগত ইশারায় প্লট আকার পেয়েছে। চতুর্থ অংশটিকে বলা যাবে গল্পটির কেন্দ্র; এর অবস্থানও মাঝামাঝি জায়গায় — কেবল সংখ্যার দিক থেকে নয়, গল্পের শরীরে অবস্থানের দিক থেকেও। গল্পটি শুরু হয়েছে কাহিনীর এই মধ্যবর্তী জায়গা থেকে; তারা ওই বাড়িতে থিতু হয়ে বসার পর। কারণ, মতিনের বাগান করার কল্পনা অন্তত প্রথমবার পুলিশ এসে ফিরে যাওয়ার আগে সম্ভব নয়।

১.৩

গল্পের প্রথম অনুচ্ছেদে বাড়িটির বর্ণনা আছে। বর্ণনাটি লেখকের, যদিও সংশ্লিষ্টদের ভাবনার বরাত দিয়ে লেখক বর্ণনাটি করেছেন। খুব সংক্ষিপ্ত এ বর্ণনার বিষয় ও ভঙ্গি নির্জলা একটা বাস্তবের আবহ তৈরি করে। এ আবহ পুরো গল্পেই অব্যাহত থেকেছে।

ওয়ালীউল্লাহ বাস্তবের বর্ণনা করেন পরিসরের সূত্র মেনে। অর্থাৎ স্থানের মূর্ত অবয়বের মধ্যে তাঁর চরিত্রেরা বিচরণ করে, ঘটনা সংঘটিত হয়। যেহেতু বাস্তব তাঁর লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ মাত্র, তাই বর্ণনা হয় খুবই সংক্ষিপ্ত, খুবই বিশেষ এবং চিত্রের মতো। বাস্তবের বর্ণনা তাঁর দরকার হয় দুই কারণে। এক. বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি। বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি হয় বর্ণনার ভঙ্গি থেকে, নির্মম নির্বাচন থেকে, আর নিরাসক্ত উপস্থাপন থেকে। দুই. ভিতরের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার জন্য ভিত্তি তৈরি করা। খুব পরিসর না নিয়েই তিনি ভিত্তি তৈরি করেন এবং ভালোভাবেই করেন। একটি বাক্য পরীক্ষা করা যাক :

> এ-সময়ে একদিন উঠানের প্রান্তে রান্নাঘরের পেছনে চৌকোণা আধ-হাত উঁচু ইটের তৈরি একটি মঞ্চের উপর তুলসীগাছটি তাদের দৃষ্টিগত হয়।

যথাসম্ভব অধিক তথ্য ঠেসে দিয়ে বর্ণনাকে চাক্ষুষ করে তোলার একটা চেষ্টা এ বাক্যে খালি চোখেই পড়া যায়। এ ধরনের নিখুঁত বর্ণনার একটা প্রয়োজন হয়ত এই যে, নিজের বলবার কথা বা দেখানোর বিষয় সম্পর্কে বিশেষ সংশয়ের অবকাশ না দিয়েই পাঠককে বর্ণনার সঙ্গী করে নেয়া যায়। উদাহরণ হিসাবে বলা যাক, তুলসীগাছটি তারা এতদিন দেখে নাই কেন — এ ধরনের একটা জিজ্ঞাসা পাঠকের মনে জাগতে পারে, এবং হয়ত জাগেও; কিন্তু গাছটি আবিষ্কৃত হওয়ার মুহূর্তের যে আয়োজন, তার প্রগাঢ়তায় সে প্রশ্ন জেঁকে বসার সুযোগ পায় না।

২.১

ওয়ালীউল্লাহর সাহিত্যকর্ম সাধারণভাবে সমকাললিপ্ত নয়; যদিও তাঁর রচনায় সমকালের কোনো কোনো চকিত আভাস মেলে। *লালসালু*, *চাঁদের অমাবস্যা*, *কাঁদো নদী কাঁদো* — তাঁর তিনটি বাংলা উপন্যাসই যথাসম্ভব সমকালকে এড়িয়ে গেছে। এমনকি তেতাল্লিশের

মন্বন্তর নিয়ে লেখা গল্পের ক্ষেত্রেও দেখি, কালের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য এঁকে দেয়ায় তাঁর অনীহা। এসব কথা বিবেচনায় রাখলে 'একটি তুলসীগাছের কাহিনী' গল্পকে বেশ ব্যতিক্রমই বলতে হয়। গল্পটি কোনো সময়কে বা ঐতিহাসিক ঘটনাপর্বকে কেন্দ্রীয়ভাবে উপস্থাপন করেছে কিনা, সে সিদ্ধান্ত নিশ্চয় তর্কাতীত নয়; কিন্তু গল্পটিতে একটা ঐতিহাসিক ঘটনার প্রত্যক্ষ উল্লেখ আছে। তারচেয়ে বড়ো কথা, দেশভাগকালীন বাস্তবতা বাদ দিয়ে গল্পটি পাঠ করা সম্ভবত অসম্ভব।

এ গল্পের সমালোচকেরা প্রায় ব্যতিক্রমহীনভাবে দেশভাগকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতার আধার রূপেই গল্পটি পাঠ করেছেন। দেশবিভাগ আমাদের প্রভাবশালী প্রবন্ধ বা আলোচনায় খুব জীবন্ত উপাদান হওয়ায় এসব পাঠে পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গি ও পক্ষপাত আরোপিত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা ও আশঙ্কা দুটোই থাকে। তা অনভিপ্রেতও নয়। টেক্সটকে বিচ্ছিন্ন পাঠ-উপাদান হিসাবে বিবেচনার দাবি সমালোচনাতত্ত্বে বহু আগেই বাতিল হয়েছে।[৩] কিন্তু কোনো পাঠ বা সিদ্ধান্তের জন্য সংশ্লিষ্ট দলিল-দস্তাবেজ এবং বিশেষত পাঠ্য টেক্সটের সাক্ষ্য-প্রমাণ তো দরকার। আমাদের সমালোচনায় এই দায় ও দায়িত্ব কদাচ চোখে পড়ে।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে যে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে কথাশিল্পী শওকত ওসমান একটি প্রবন্ধ পড়েন। প্রবন্ধটি পরে ছাপা হয় 'দেশ' পত্রিকায়। তাতে 'একটি তুলসীগাছের কাহিনী' সম্পর্কে শওকত ওসমান লিখেছেন :

> পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই অরাজকতার মধ্যে কয়েকজন কেরাণী এক হিন্দু ভদ্রলোকের পরিত্যক্ত দালান দখল করে বসল। তারপর কালনেমির লঙ্কাভাগ। কীভাবে ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের উদ্দেশ্যে দালানের কামরাগুলো ভাগ করা যায় – তার এলোপাতাড়ি হিসেব। এতদিন ফ্যামিলিসহ শহর-বাস নসীবে জোটে নি, এবার শয্যাসুখও পাকিস্তানের বদৌলত মুঠোর ভেতর। (উদ্ধৃত, সৈয়দ ১৯৮৩ : ৬৩)

তানভীর মোকাম্মেল লিখেছেন : 'তারা ('স্বল্পশিক্ষিত মুসলমান কেরানীকুল') লড়কে-লেঙ্গে-পাকিস্তানের পেছনে জমায়েত হয়েছিল এই আশায় যে পাকিস্তান তাদের জন্য বয়ে আনবে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য।' (তানভীর ২০০০ : ১৮)

এসব মন্তব্যে দেশবিভাগ-সম্পর্কিত অতি প্রচলিত কিছু মতের প্রতিফলন ঘটেছে,[৪] যেগুলো ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় টেকানো মুশকিল।[৫] গল্পের বর্ণনাধারায় অনুকূল ইঙ্গিত পাওয়া গেলে 'কাব্যসত্যের দাবিতে' 'ঐতিহাসিক সত্যকে' জলাঞ্জলি দিতে আমরা নিশ্চয় কুণ্ঠাবোধ করব না। কিন্তু এসব আলোচনায় এরকম ইশারাও গরহাজির।

যেমন, উপরের দুটি মন্তব্যে হিন্দুবাড়িতে আশ্রয় নেয়া কেরানিকুল উপস্থিত হয়েছে খলচরিত্র হিসাবে। কিন্তু গল্পে যেসব ইশারা পাওয়া যায় তার প্রায় সবটাই এর বিপরীত। বলা হয়েছে, 'বাড়িটা তারা দখল করেছে'। এই দখলদারিত্বের মধ্যে নৈতিক বা আইনি অপরাধ যেন প্রধান হয়ে না ওঠে, তার বন্দোবস্ত করেছেন লেখক। বলেছেন : 'অবশ্য লড়াই না করেই; তাদের সামরিক শক্তি অনুমান করে বাড়ির মালিক যে পৃষ্ঠপ্রদর্শন

করেছেন তা নয়'। এর পরের অংশটি আরো তাৎপর্যবহ। বলা হচ্ছে, এরা নিতান্ত ছাপোষা দরিদ্র কেরানি মানুষ। নিরীহ। ডেরার সন্ধানে উদয়াস্ত ঘুরেছে। এবং সৌভাগ্যবশত বাড়িটির সন্ধান পেয়েছে।

অর্থাৎ, দেশভাগের সাথে যুক্ত বহুলশ্রুত কিছু প্রচলিত অনুমান যেন এই পাঠে বাধা হয়ে না দাঁড়ায় সে ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন লেখক। এসব ক্ষেত্রে সাধারণত সাম্প্রদায়িক নিপীড়নের কথা তোলা হয়। জোর-জুলুমের কথা বলা হয়। কিন্তু লেখক আমাদের ভাবতে উদ্বুদ্ধ করেছেন যে, বর্তমান ঘটনায় এসব বহুলশ্রুত বা অনুমিত ব্যাপারগুলো ঘটেনি।

অবশ্য ঘটনাটা প্রচলিত ছাঁচে না ঘটলেও এটা একটা দখলই বটে। তারা তালা ভেঙে একসঙ্গে বাড়িতে প্রবেশ করে। এই দখলের ব্যাপারটা গল্পের মূল আবহের জন্য জরুরি ছিল।

'পরদিন শহরে খবরটা ছড়িয়ে পড়লে অনাথিতদের আগমন শুরু হয়। মাথার ওপর একটা ছাদ পাবার আশায় তারা দলে-দলে আসে'। এরপর অনেকদূর পর্যন্ত ঠারেঠোরে এরকম বহু লোকের কথা বলা হয়েছে; লোকের দুরবস্থা ও আবাসহীনতার কথা বলা হয়েছে। বাড়িতে আশ্রয়-পাওয়া দলটির মনস্তাত্ত্বিক গতিবিধির কিছু অংশ আশ্রয় না-পাওয়া এসব মানুষের অবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। কিন্তু এসব বর্ণনার মধ্য দিয়ে দেশভাগকালীন পরিস্থিতির একটা-দুটা দিকও বেশ পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে।

২.২

'একটি তুলসীগাছের কাহিনী' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'নয়াসড়ক' নামের একটি সাহিত্যপত্রে।[৬] প্রায় আগাগোড়া পুনর্লিখন করে লেখক গল্পটি তাঁর দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ *দুই তীর ও অন্যান্য গল্প*-এ (১৯৬৫) প্রকাশ করেন। এই দুই লিখন মিলিয়ে পাঠ করলে বোঝা যায়, পুনর্লিখনের সময় সমসাময়িকতার চিহ্ন, বিশেষত দেশভাগ-সম্পর্কিত 'নেতিবাচক চিহ্ন' তিনি যথাসম্ভব কমিয়ে ফেলতে চেয়েছেন। যেমন, একটি বাক্য ছিল এরকম : 'পুলিশে খবর দিয়েছিল ওরাই যারা শহরের অন্য কোন প্রান্তে তখন ডাকাতির ফিকিরে ছিলো বলে এখানে চার ঘণ্টা আগে, বা দু'ঘণ্টা আগেও এসে পৌছুতে পারেনি'। গ্রন্থভুক্ত সংস্করণে বাক্যটি বদলে হয়েছে এরূপ : 'সন্দেহ থাকে না যে, পুলিশকে খবর দিয়েছে তারাই যারা সময়মতো এখানে না এসে শহরের অন্য কোনো প্রান্তে নিষ্ফলভাবে বাড়িদখলের ফিকিরে ছিল'। 'ডাকাতি' শব্দের বদলে এখানে 'দখল' ব্যবহৃত হয়েছে। 'যে গৃহকর্ত্রী বছরের পর বছর এ তুলসীতলে প্রদীপ দিয়েছে সে আজ কোথায়?' — এ বাক্যের পর পুরনো লিখনে পাচ্ছি একটি ছোট বাক্য — 'কেন চলে গেছে?', যা পুনর্লিখিত সংস্করণে অনুপস্থিত। অন্য অনেক পরিবর্তন-পরিমার্জনের মধ্যে শেষাংশের এ অংশটির বাদ পড়াটা বোধ করি সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ : 'নীল কুঠি-বাড়ীর ফ্যাশনে তৈরি দরজা-জানালাগুলো খাঁ-খাঁ করতে লাগলো। কিন্তু সে আর ক-দিন। রঙবেরঙের পর্দা ঝুলবে সেখানে'।

গ্রন্থভুক্ত সংস্করণে এ কথাগুলো নাই।

শেষের বাক্যটিতে ভর দিয়ে শওকত ওসমান মন্তব্য করেছেন : '১৯৪৮ সালে লেখা এই গল্প যেন পাকিস্তানের গোটা ভবিষ্যতের ইশারা'। (উদ্ধৃত, সৈয়দ ১৯৮৩ : ৬৩) তিনি সম্ভবত স্মৃতি থেকে বাক্যটি উদ্ধৃত করেছেন। ফলে একটু পরিবর্তিত হয়ে বাক্যটি দাঁড়িয়েছে এরকম : 'এবার ত জানালায় রঙিন পর্দা ঝুলবে। (?)' লক্ষণীয়, অতিরিক্ত একটি 'ত' যুক্ত হওয়ায় বাক্যটিতে যে শেষের আমদানি ঘটেছে, তার উপর ভর দিয়ে তিনি মন্তব্যটি করেছেন বা করতে পেরেছেন। অন্যভাবে বলা যায়, মন্তব্যটি করার আভ্যন্তর তাগিদ তাঁকে দিয়ে হয়ত অজ্ঞাতসারেই বাক্যটি বদলে নিয়েছেন। মূল পাঠের বাক্যটি — 'রঙবেরঙের পর্দা ঝুলবে সেখানে' — সাধারণ অর্থেই পাঠ করা যায়। এই অর্থে যে, সরকার যখন বাড়িটার দখল নিয়েছে, তখন সরকারি কাজেই এটি ব্যবহৃত হবে। রঙিন পর্দা ঝুলবে। কিন্তু তাতে বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হওয়া মানুষগুলোর কিছু আসবে যাবে না।

যাই হোক, দুই লিখনের তুলনা করে জোর দিয়ে বলা যায়, দেশভাগের বাস্তবতাকে বড়ো করে তোলে — বিশেষত মূল্য-আরোপ করে — এমন অংশ লেখক যথাসম্ভব কাটছাঁট করেছেন।

২.৩

কিন্তু মূল্য-আরোপ থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকলেও দেশভাগের বাস্তবতার মধ্যেই গল্পটির অস্তিত্ব ও সিদ্ধি। অন্তত দুবার সময়টিকে চিহ্নিত করার জন্য 'হুজুগ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। বাড়িটির দখল নেয়া এবং পুলিশের রিপোর্ট চাপা পড়া — এই দুই ঘটনা কেবল 'হুজুগ'-এর সময়েই সম্ভব। এই ব্যবহার অবশ্য লেখকের দিক থেকে সময়টির গায়ে কোনো একপেশে চিহ্ন সেঁটে দেয় না। কারণ, অন্যত্র পুলিশ আসা প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে : 'দেশময় একটা ঘোর পরিবর্তনের আলোড়ন বটে কিন্তু কোথাও যে রীতিমতো মগের মুলুক পড়েছে তা নয়'। গবর্নমেন্টের বাড়ি রিকুইজিশন দেয়া ওই সময়েরই বাস্তবতা। 'হাতে বন্দুক থাকলে নিরীহ মানুষেরও দৃষ্টি পড়ে পশু-পক্ষীর দিকে'। কিংবা 'উলঙ্গ বালব-এর আলোয় তার সযত্নে মেছোয়াক করা দাঁত ঝকঝক করে'। — এ ধরনের বাক্য সমকালীন দাঙ্গা-হাঙ্গামার স্মারক হিসাবে বিবেচনার যোগ্য।

তুলসীগাছটি যে-সকালে আবিষ্কৃত হল, সে-সন্ধ্যার-আলোচনা দেশবিভাগকালীন মুসলমান মনস্তত্ত্বের এক সংক্ষিপ্ত কিন্তু তীক্ষ্ণ প্রতিবেদন। এখানে বলে রাখা দরকার, এ গল্পের যে কোনো পাঠে হিন্দু ও মুসলমান শ্রেণিদুটি অতি গুরুত্বপূর্ণ । কেবল তুলসীগাছটিকে কায়দামাফিক প্রতীকী তাৎপর্যে উন্নীত করার জন্যই নয়, দুই পক্ষের স্থায়ীভাবে স্থানচ্যুতিও জরুরি ছিল। এপারে আসা মানুষগুলোর পূর্বতন অবস্থা বর্ণনার ক্ষেত্রে লেখক ইচ্ছাকৃত সাধারণীকরণ করেছেন। গল্পের গড়নের দিক থেকে এই সাধারণীকরণের দরকারটা অতি স্পষ্ট। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে দেশভাগের আগে কলকাতা-নিবাসী কেরানি কিংবা মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মুসলিম জনগোষ্ঠীর অবস্থারও একটা সাধারণ চিত্র মেলে। এরা যে হিন্দু রীতিনীতি ভালো জানে না, তা আসলে সমকালীন বাঙালি মুসলমান ও হিন্দুর পারস্পরিক চিন-পরিচয়ের ঘাটতিই নির্দেশ করে।

এভাবে বহু উপাদান জড়ো করে দেখানো সম্ভব যে, 'একটি তুলসীগাছের কাহিনী' গল্পটি দেশবিভাগকালীন বাস্তবতায় শুধু আকারই পায়নি, ওই বাস্তবতা দ্বারা এর আভ্যন্তর সংগঠনও নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এ বিবেচনাকে কেন্দ্রে রেখে গল্পটির পাঠ সম্পর্কে সিদ্ধান্তসূচক মন্তব্য করেছেন জীনাত ইমতিয়াজ আলী। লিখেছেন :

> এ গল্পে প্রতীকের প্রয়োগ ঘটেছে দুটি বিষয় - তুলসীগাছ ও পুরানো আমলের দোতলা বাড়িটিকে আশ্রয় করে। শীর্ণ তুলসীগাছটি দেশ-বিভাগের ফলে বাস্তুচ্যুত, বিশীর্ণ ব্যক্তিদের অস্তিত্বেরই প্রতীক। আর পুরোনো বাড়িটি দ্বিজাতিতত্ত্ব-নির্ভর এ দেশীয় রাষ্ট্রনৈতিক বাস্ত বতাকেই করেছে প্রতীকায়িত। (জীনাত ২০০১ : ৭০)

এ মন্তব্যের প্রথমাংশ সংকোচক — তুলসীগাছকে কেবল 'বিশীর্ণ ব্যক্তিদের' সাথে মিলিয়ে পড়লে, অর্থাৎ চরিত্রগুলোর আশা ও হতাশার সাথে তুলসীগাছের তাজা ও মৃতপ্রায় রূপের তুলনা করলে তা 'প্রতীক' হয় না, হয় 'রূপক'; আর দ্বিতীয়াংশ অতিমাত্রায় উচ্চাভিলাষী — রাষ্ট্রনৈতিক বাস্তবতার উত্থান-পতনের প্রতি অন্তত প্রকাশ্য কোনো আগ্রহ এই টেক্সটে দেখা যায়নি। মন্তব্যটির গোড়ার গলদ হল : এটি মন্তব্যই — ব্যাখ্যাবিশ্লেষণহীন এবং টেক্সটের সাথে আরোহী বা অবরোহী কোনো কায়দাতেই সম্পর্কিত নয়। কিন্তু আমরা ইতোমধ্যেই দেখিয়েছি, এ গল্পে এমন প্রচুর প্রকাশ্য বা গোপন নিদর্শন আছে, যা দিয়ে মন্তব্যটিকে অন্তত অংশত ফলিয়ে তোলা যেত।

৩.১

এ গল্পের 'মানবতাবাদী' পাঠও বেশ জনপ্রিয়। কয়েকজন সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধৃত করা যাক :

শওকত ওসমান লিখেছেন : 'এই গল্পের সব চেয়ে লক্ষণীয় দিক হচ্ছে মানবিকতাবোধ। ... শেষ পর্যন্ত ধর্মান্ধতা মানবিকতার কাছে পরাস্ত'। (উদ্ধৃত, মকসুদ ১৯৮৩ : ৬৩) সৈয়দ আবুল মকসুদের মন্তব্য : 'সাময়িক ঘটনা উপলক্ষ্য মাত্র আসলে এতে চিরন্তন মানব-মনের বার্তাই পরিবেশিত হয়েছে। শুরু যে-ভাবেই হোক কাহিনী এক পাক ঘুরেই শেষ হয়েছে মানবিক গন্তব্যে : উচ্চারিত হয়েছে মানুষের জয়ধ্বনি'। (সৈয়দ ১৯৮১ : ৭০)

আবদুল মান্নান সৈয়দ 'মানবিকতা'র জয়ধ্বনি ঘোষণাকেই পেয়েছেন এ গল্পের একমাত্র তাৎপর্য হিসাবে। লিখেছেন : 'কী বলতে চাচ্ছেন ওয়ালীউল্লাহ এই গল্পে? তুলসীগাছের প্রতীকে? বলতে চাচ্ছেন মানবিকতা সাম্প্রদায়িকতার অনেক ঊর্ধ্বে। সেজন্যই দখলদার নিম্নবিত্ত মানুষেরা আজ যখন হিন্দু সম্প্রদায়ের নিন্দা করছে, তখনি আবার যত্ন নিচ্ছে তুলসীগাছের। একটি তুলসীগাছের কাহিনী আসলে বৃক্ষের কাহিনী নয় — মানুষের কাহিনী'। (আবদুল ২০০১ : ২৫)

এ গল্পকে 'মানুষের কাহিনী' বলে বর্ণনা করার একটা শক্ত প্রমাণ অবশ্য পাওয়া যায় গল্পটির শেষ বাক্যে : 'কেন পড়েনি সে-কথা তুলসীগাছের জানবার কথা নয়, মানুষেরই জানবার কথা'। কিন্তু 'মানুষের কাহিনি' মাত্রই 'মানবিক কাহিনি' হবে বা মানবিকতার

জয়গানে মুখর হবে — এমন নাও হতে পারে। তারচেয়ে বড়ো কথা, কোনো টেক্সট সম্পর্কে 'মানুষ', 'মানবিক' বা 'মানবিকতা'র মতো শব্দের সাধারণ ব্যবহার বিশেষ তাৎপর্য বহন করে না। কারণ, মানব-রচিত যে কোনো কিছু সম্পর্কেই এ শব্দগুলো কোনো-না-কোনো মাত্রায় ব্যবহার করা যাবে। তাই সম্পূর্ণ বা আংশিক সংজ্ঞায়ন ছাড়া পাঠ হিসাবে শব্দগুলোর ব্যবহার তাৎপর্যহীন। এ প্রসঙ্গে মিশেল ফুকোর মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য :

> Humanism is something entirely different. It is a theme or rather a set of themes that have reappeared on several occasions over time in European societies; these themes always tied to value judgments have obviously varied greatly in their content as well as in the values they have preserved. Furthermore they have served as a critical principle of differentiation. In the seventeenth century there was a humanism that presented itself as a critique of Christianity or of religion in general; there was a Christian humanism opposed to an ascetic and much more theocentric humanism. In the nineteenth century there was a suspicious humanism hostile and critical toward science and another that to the contrary placed its hope in that same science. Marxism has been a humanism; so have existentialism and personalism; there was a time when people supported the humanistic values represented by National Socialism and when the Stalinists themselves said they were humanists.
> From this we must not conclude that everything that has ever been linked with humanism is to be rejected but that the humanistic thematic is in itself too supple too diverse too inconsistent to serve as an axis for reflection. (ফুকো ১৯৮৪)

উপরে যে তিনজন পাঠকের মন্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে, তাঁদের প্রত্যেকেই মন্তব্যের ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করেছেন গল্পের একটি অনুচ্ছেদকে, যেখানে দখলকৃত বাড়ির প্রাক্তন গৃহকর্ত্রীর বর্তমান দুর্দশা সম্পর্কে অনুমান করা হয়েছে। অনুচ্ছেদটি বেশ সুলিখিত, বিস্তারধর্মী এবং আবেগ-উদ্দীপক। গল্পের শেষাংশে অংশটি পুনর্ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে অংশটির লক্ষণাত্মক বা ব্যঞ্জনাত্মক পাঠ খুবই সম্ভব। কিন্তু যেভাবে সমালোচকেরা অংশটিকে পরিণামনির্দেশক চিহ্ন হিসাবে পাঠ করেছেন, তা অতি সারল্য-দোষে দুষ্ট। কারণ : প্রথমত, গৃহকর্ত্রী সম্পর্কে এ ভাবনা মতিনের — সবার নয়; দ্বিতীয়ত, গৃহকর্ত্রীর ছলছল চোখ তুলসীগাছটির গোড়ায় পানি দেওয়ার একমাত্র কারণ নয়, এবং নিশ্চিত কারণও নয় — অনেকগুলো সম্ভাব্য কারণের একটা মাত্র; তৃতীয়ত, শেষ দশদিন তারা তুলসীতলায় পানি দেয়নি। বলা যায়, তাদের সুসময়ে তারা মানবিক ছিল, দুঃসময়ে নয়। এদিক থেকে বরং বলা যায়, গল্পটি 'মানবিক' নয়, 'অমানবিক'।

৩.২

'মানবিকতা'-নির্ভর উপরি-উক্ত পাঠগুলো নির্ণিত হয়েছে 'সাম্প্রদায়িকতা'র ধারণার বিপরীতে। কিন্তু শব্দ-দুটি পরস্থিতি-নির্বিশেষে বিপরীত শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে না। কেননা, কেউ একজন বা কয়েকজন স্ব-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করেও সাম্প্রদায়িক

নাও হতে পারে। আবার তারা অল্প সময়ের ব্যবধানে বা একই সময়ে করতে পারে যথাক্রমে 'সাম্প্রদায়িক' ও 'মানবিক' আচরণ। আমরা আগেই দেখিয়েছি, এ গল্পে বাড়ি-দখলকারী দলটিকে সাম্প্রদায়িক বা নেতিবাচক হিসাবে চিহ্নিত করার কোনো আলামত যেমন চোখে পড়ে না, ঠিক তেমনি দেশভাগ-সম্পর্কিত মূল্য-আরোপ থেকে যথাসম্ভব মুক্ত থেকেই বয়ানটি নিষ্পন্ন হয়েছে। এ গল্পের জন্য, আগেই উল্লেখ করেছি, হিন্দু ও মুসলমান শ্রেণিদুটি অতি জরুরি। এখন যোগ করা যাক, এটি বিশেষভাবে পূর্ববাংলার গল্প — ভাষা ও ভঙ্গির দিক থেকে তো বটেই, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বিবেচনায়ও।

প্রশ্ন হল : এ গল্পের 'আমরা' এবং 'তারা' কি বাড়ি খুঁজে পাবার পরে তৈরি হয়েছিল, নাকি আগে থেকেই ছিল। আগে থেকেই যদি থাকে তাহলে তার উৎস কী? যদি না থাকে তাহলে এ চরিত্রগুলো বাড়ি খুঁজে পাবার মুহূর্তে একসাথে আনন্দিত বা ভীত হয় কীভাবে?

আশপাশের নানা লক্ষণ দেখে মনে হয়, এই 'শিক্ষিত' কেরানি মধ্যবিত্ত শ্রেণিটি কমবেশি পারস্পরিকতায় যুক্ত ছিল। এখানে আগমনের আগে থেকেই। তাদের একটা 'আমরা' বোধ আগে থেকেই তৈরি ছিল। সেটা চিনপরিচয়ের কারণে হতে পারে, কিংবা কলকাতার বাস্তবতার কারণেও হতে পারে। 'একাউন্টস-এর মোটা বদরুদ্দিন' — এরকম পরিচয় প্রমাণ করে, যারা বাড়ি পেয়েছে আর যারা পায়নি, তারা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ না হোক, অচেনা নয়।

এ বাস্তবতা দেশভাগকালীন কলকাতা-নিবাসী শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের বাস্তবতার সাথে সংগতিপূর্ণ।

স্থানান্তরের আগেকার অপেক্ষাকৃত বড়ো পরিসরের শিথিল 'আমরা' পরে অপেক্ষাকৃত কংক্রিট বাস্তবতায় নতুনভাবে বিন্যস্ত হয়েছে বাড়ি-পাওয়া আর না-পাওয়া দলের মধ্যে। অব্যবহিত অস্তিত্বের সাথে বাড়িটি যুক্ত হয়ে যাওয়ায় 'আমরা'র বোধ কিছু সময়ের জন্য অনেক শক্তিশালী হয়েছে।

ওয়ালীউল্লাহর লেখালেখির সাফল্যের এবং বাস্তবসম্মিতির একটা বড়ো উৎস এই 'আমরা'র বোধ। তিনি মূলত কাজ করেছেন পূর্ববাংলার বাঙালি মুসলমান সমাজ নিয়ে। এই জনগোষ্ঠী তাঁর বড়ো 'আমরা'। এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন বলেই তাঁর 'বাস্তব' সহজেই অনেক বেশি 'বিশেষ' এবং 'স্বাভাবিক' হয়েছে। আসলে তাঁর 'আমরা' আরো ছোট — ওই জনগোষ্ঠীর মধ্যবিত্ত শিক্ষিত চাকুরিজীবী অংশটি। কিন্তু এ অংশটিকে তিনি গ্রামীণ বাস্তবতা, পূর্বতন আচার-আচরণ ও সম্পর্কের টানাপড়েন থেকে বিচ্ছিন্ন করে হাজির করেননি। অর্থাৎ তাঁর মধ্যবিত্ত শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর নির্মাণের পেছনে পূর্বোল্লিখিত বড়ো 'আমরা'র কাঠামোটি কাজ করে গেছে — আকাঙ্ক্ষার দিক থেকে নয়, তবে সম্পর্কের দিক থেকে।

কিন্তু এত সুপরিসর 'আমরা' তো বিশেষ কোনো গল্পে আঁটানো সম্ভব নয়। আঁটাতে গেলে অতি-সাধারণীকরণের ঝুঁকি তৈরি হয়। ওয়ালীউল্লাহ মোটেই সাধারণীকৃত মন্তব্যের লেখক নন। তিনি বিশেষকেই মূর্ত করতে চেয়েছেন। এ গল্পের বাইরের স্তরটি নির্মাণ করেছে কয়েকজন পুরুষ-ইংরেজিশিক্ষিত-মুসলমান-স্থানান্তরিত মধ্যবিত্ত চরিত্র। তাদের

মধ্যে পক্ষ-বিপক্ষের বিভাজন তৈরি হয়েছে বাড়ি পাওয়া আর না-পাওয়াকে কেন্দ্র করে। কিন্তু চরিত্রগুলোর ভাষা, নৈতিকতা, আচরণ, সুখ-দুঃখ বা ভালো-মন্দের বোধ — এই স্তরে পরীক্ষা করলেই বোঝা যাবে, পূর্বোল্লিখিত বড়ো 'আমরা'কে পুরোপুরি কার্যকর রেখেই ওয়ালীউল্লাহ লিখেছেন। 'একটি তুলসীগাছের কাহিনী' গল্পের গভীর স্তরে আমরা এই সবগুলো স্তরকেই সক্রিয় দেখতে পাব।

ওয়ালীউল্লাহর ক্ষেত্রে সবসময় এমন হয় — তিনি কাজ করেন পরম 'বিশেষ'-এর পরিসরে ও মেজাজে, সেই বিশেষকে মজবুত করে বাঁধেন বিশেষ স্থানের সুনির্মিত মূর্ত জমিনে; কিন্তু অন্তর্গত কাঠামোয় যুক্ত থাকেন বড়ো পরিসরের জনগোষ্ঠীর সাথে।

ভাষাভঙ্গি, শব্দব্যবহার এবং চরিত্রগুলোর আবেগ-কল্পনা পরীক্ষা করলে বোঝা যায়, চরিত্রগুলো বা সার্বিক পরিস্থিতি পুববাংলার মুসলমান জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে। পশ্চিম বাংলা বা হিন্দু জনগোষ্ঠীর প্রেক্ষাপটে এই পরিস্থিতিতে সম্ভবত অন্যরকম গল্প হত।

৩.৩

তুলসীগাছটি যেদিন আবিষ্কৃত হয়, সেদিন বিশেষ মানসিক পরিস্থিতিতে গল্পের চরিত্রগুলো সাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠে। 'অল্প সময়ের মধ্যে এদের রক্ত গরম হয়ে ওঠে, শ্বাস-প্রশ্বাস গরম হয়ে আসে'। কিন্তু তবু তারা তুলসীতলায় পানি দেয়, গাছটির যত্ন নেয়। আবার পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে গাছটি তাদের যত্ন-আত্তি থেকে বঞ্চিতও হয়। এই যে আচরণের বৈচিত্র্য — পরিবর্তন ও স্ববিরোধ, একেই বলতে পারি 'একটি তুলসীগাছের কাহিনী' গল্পের 'মানবিক পরিস্থিতি'। কোনো নির্বিশেষ মানবিকতা বা মানবতা নয়, বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশিষ্ট মানবিক আচরণই এ গল্পের শক্তি। এ গল্পের আবিষ্কার।

৪.১

ওই পরিস্থিতিতে চরিত্রগুলোর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অনুসরণ করে 'একটি তুলসীগাছের কাহিনী' গল্পের অপেক্ষাকৃত সামঞ্জস্যপূর্ণ পাঠ সম্ভব। 'অপেক্ষাকৃত সামঞ্জস্যপূর্ণ' এ অর্থে যে, এই পাঠে গল্পের সম্ভাব্য সর্বাধিক ইঙ্গিতকে অর্থাৎ চিহ্ন-প্রতীক বা কোডকে অঙ্গীভূত করে নেয়া যাবে।[৭] ওয়ালীউল্লাহর অন্য অনেক রচনার মতো এ রচনায়ও মনস্তাত্ত্বিক গতি-প্রকৃতি অনুসরণের পর্যাপ্ত আহ্বান বিদ্যমান।

পুলিশের দুইবার আগমন চরিত্রগুলোর মনোজাগতিক দশার প্রধান নিয়ন্ত্রক; আর তুলসীগাছটির সাথে তাদের আচরণ মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার প্রধান অভিব্যক্তি। বাড়ি-দখলের পর প্রথমবার পুলিশ আসার পূর্ব পর্যন্ত এদের ব্যক্তিগত বা সামষ্টিক ক্রিয়াকর্মের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। 'যথাসময়ে বে-আইনি বাড়ি-দখলের ব্যাপারটা তদারক করবার জন্য পুলিশ আসে'। — এ বাক্য ইঙ্গিত দেয়, রাষ্ট্রিক ও আইনি পরিস্থিতি মোটামুটি স্বাভাবিক ছিল — অন্তত গল্পে; আর 'যথাসময়ে' শব্দটি বলে দিচ্ছে, পুলিশ আসার ঘটনাটা ঘটেছে অনতিবিলম্বে। পুলিশ এলে 'এরা রুখে দাঁড়ায়'। সম্ভাব্য সব ধরনের প্রতিক্রিয়ায় তাদের একটা মরিয়া ভাব প্রকাশ পায়। তাদের এই প্রতিক্রিয়া সাব-ইন্সপেক্টরের রিপোর্টকে সাময়িকভাবে হলেও প্রভাবিত করে থাকবে। রিপোর্টের আনুকূল্যে তাদের বাড়ি ছাড়তে হয় না।

কী ছিল এই রিপোর্টে? না, রিপোর্টে তাদের দখলদারির পক্ষে কোনো সাফাই গাওয়া হয়নি। তাদের নামে বাড়িটি বরাদ্দও হয়নি। কিন্তু আইনের অস্পষ্টতাহেতু বা অন্য কোনো কারণে 'ফাইল চাপা' পড়ায় এমন এক বাস্তবতা তৈরি হয়েছে, যা থেকে দখলকারীরা ভাবতে পেরেছে, এ বাড়ি তাদের মালিকানায় থাকবে। তাহলে প্রথমবার পুলিশ এসে ঘুরে যাওয়ার মধ্য দিয়ে তাদের ধারণা হয়েছে, '...আস্তানাটি কেউ হাত থেকে কেড়ে নিতে পারবে না...'। পরবর্তী ঘটনাধারার জন্য এ বিশ্বাস জন্মানো জরুরি ছিল, আর এই বিশ্বাস জন্মানোর জন্য পুলিশ আসা জরুরি ছিল। কারণ, এরা লেঠেল বা রাজনৈতিক কর্মী নয় বলে গায়ের জোরে বাড়ির দখল রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তদুপরি বাড়ি না-পাওয়া বিপুল লোকের বিষনজরে থাকায় একটা বাড়তি মনস্তাত্ত্বিক চাপ নিশ্চয় তারা অনুভব করছিল। পুলিশের অলিখিত অনুমোদন তাদের চাপমুক্ত করে থাকবে। এরা শিক্ষিত, 'ভদ্র ঘরের ছেলে', সরকারি কেরানি, এবং করুণভাবে নিরীহ। তাই পুলিশ তথা আইনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ এবং নির্ভরতা থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এরা একটু বেশি পরিমাণেই নিরীহ। পুলিশের হাতে উচ্ছেদ না হওয়াটাকে তারা বাড়িটার স্থায়ী মালিকানা বলে ভুল করে। তাদের 'ভুল ভাঙতে' অবশ্য দেরি হয় না। কিন্তু এই 'ভুলে'র মধ্যেই গল্পটি সম্পন্ন হয়ে ওঠে।

আমরা আগেই বলেছি, গল্পটি ব্যক্তিগত নয়, বরং সামষ্টিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার আধার। আর ব্যক্তির সাথে সমষ্টির সম্ভাব্য দ্বন্দ্ব সুকৌশলে জিইয়ে রেখে তাৎপর্যপূর্ণভাবে তাকে ব্যবহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তাদের ব্যক্তিগত রুচি, স্বভাব, অভাব, স্বপ্ন ইত্যাদির স্বাতন্ত্র্য ঠিক ততটাই প্রকাশিত হয়েছে, যতটা হলে সামষ্টিকতার কার্যকর সুতাটি ছিঁড়ে যাবে না। যেমন মোদাব্বের 'হুজুগে মানুষ' এবং সম্ভবত খানিকটা চরমপন্থি। কিন্তু তার বাড়াবাড়ি কখনোই ঐ পর্যায়ে যায় না, যেখানে গেলে বাকিদের দ্বিধা-দ্বন্দ্বকে আমলে না নিয়ে সে তুলসীগাছটি উপড়ে ফেলবে। ফলে শেষ পর্যন্ত সে সমষ্টির অংশ হিসাবে — অন্তত গল্পধৃত সময়টাতে — নিটোল ঐক্যে অটুট থাকতে পারে।

নিঃসন্দেহে এ ধরনের সামষ্টিকতা এক বিরল ব্যাপার। বিশেষ সময়ের বিশেষ বাস্তবতা এবং ঘটনা-পরম্পরাই এ ধরনের সামষ্টিকতা তৈরি করেছে। এজন্য বেশ ঝুঁকি নিয়ে চরিত্রগুলোর গোড়া কেটে দিতে হয়েছে। বাদ পড়েছে গ্রামের বাড়ি, পিতা-মাতা, সংসার ইত্যাদির যাবতীয় বন্ধন। অতসব বৈচিত্র্যের মধ্যে এতজন মানুষের সেই সমরূপতা নির্মাণ প্রায় অসম্ভব, যা সামষ্টিক অভিব্যক্তির জন্য জরুরি। অনেক কিছু বাদ দিয়ে তাদের সাযুজ্য তৈরি হয়েছে শিক্ষায়, চাকরিক্ষেত্রের সমরূপতায়, আর বিশেষভাবে অতীত ইতিহাসে। এই ইতিহাসটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। বলা হয়েছে, তারা সবাই কলকাতায় ছিল, এবং মোটেই ভালো ছিল না। খারাপ অবস্থার করুণতম দশাটি 'রোগাপটকা' ইউনুসের পূর্বতন আবাসের এবং মানসিকতার বর্ণনায় ধরা পড়েছে। অন্যদের অবস্থা সম্ভবত অত খারাপ ছিল না। কিন্তু ততটা খারাপ ছিল, যতটা খারাপ হলে এই অনিশ্চিত বাড়িটির এজমালি মালিকানার তুচ্ছতাও তাদের মধ্যে 'একটা নতুন জীবন' সঞ্চার করতে পারে।

উৎফুল্ল হয়ে তাদের কেউ কেউ যখন প্রস্তাব করে, 'কী হে, চা-মিষ্টিটা হয়ে যাক'। — তখনকার উৎফুল্লতার কারণগুলো এভাবে সূত্রবদ্ধ করা যায় :

এক. তারা মাথা গোঁজার ঠাঁই পেয়েছে।

দুই. অন্য অনেকে পায়নি, এবং শহরে বাসস্থানের সংকট প্রবল।

তিন. পুলিশ এসে ঘুরে যাওয়ায় একটা আইনি নিশ্চয়তা পাওয়া গেছে।

চার. তাদের পূর্বতন অবস্থার তুলনায় বর্তমান বাড়ির পরিসর এবং হালচাল অনেক উন্নত।

এর মধ্যে শেষেরটিই নিঃসন্দেহে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অন্তত সম্ভাব্য সুখকর জীবনের আশার হিসাব করলে। কী আশা? 'তাদের জীবনে সবুজ তৃণ গজাবে, ধমনিতে সবল সতেজ রক্ত আসবে, হাজার দু-হাজারওয়ালাদের মতো মুখে ধন-স্বাস্থ্যের জলুস আসবে'। এ ধরনের সম্ভাবনা তাদের মনে যে আশার সঞ্চার করেছে তার পরিচয় দিতে টেক্সটে বড়ো এক অনুচ্ছেদ রচিত হয়েছে। সেই অনুচ্ছেদে আছে মূলত তাদের পূর্বতন করুণ দশার বর্ণনা। এতে নিশ্চিত করে বলা যায়, অন্য অনেক টেক্সটের মতো এখানেও মনোজাগতিক বাস্তবতা আসলে বস্তুজাগতিক — বিশেষত অর্থনৈতিক — বাস্তবতার প্রতিক্রিয়া মাত্র। অন্য আরেক দিক থেকেও এটি শ্রেণির মামলা। এই মানুষগুলোর আত্মকেন্দ্রিক সংকীর্ণ জীবনদৃষ্টিই বলে দেয়, এরা মধ্যবিত্ত দলভুক্ত।

কারণ যাই হোক, আমরা বলতে পারি — তারা সবাই আশাবাদী অবস্থায় আছে। 'মোঘলাই কায়দায়' খানাদানা এবং গানের আসর তাদের সামষ্টিক মনস্তত্ত্বের আশাবাদী অবস্থাকেই চিহ্নিত করে। এবং এই অবস্থায় তুলসীগাছটি আবিষ্কৃত হয়। আমরা বলতে পারি, তুলসীগাছটি আবিষ্কৃত হওয়ার জন্য এই অনুকূল সময়টি বেছে নেয়া হয়। গাছটির অবস্থানের যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে, তাতে এতগুলো লোকের মধ্যে কোনো একজনের চোখে পড়তে এত দেরি হওয়ার কথা নয়। কিন্তু হয়েছে। অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হতে সময় লেগেছে। অনুকূল পরিস্থিতিটি হল আশায়-আশ্বাসে টইটম্বুর অবস্থা। আগে আবিষ্কৃত হলে তুলসীগাছটির প্রতি তাদের আচরণ অন্যরকম হতে পারত। যেমন, বাড়ি-দখলের সময় দেখলে তাদের কেউ হয়ত গাছটি উপড়ে ফেলত। কিন্তু আজ, এ ধরনের মানসিক প্রশান্তি আর স্থিতির মধ্যে গাছটি আবিষ্কার করে তারা 'কেমন স্তব্ধ হয়ে থাকে', 'হতভম্ব হয়ে' পড়ে।

তুলসীগাছটিকে সবার গোচরে আনার কায়দাটিও হয়েছে সুন্দর। দিনটি ছিল রোববার — ছুটির দিন। সবাই বাড়িতেই ছিল। মেছোয়াক করতে করতে গাছটি 'হুজুগে মানুষ' মোদাব্বেরের নজরে পড়ে। তার 'প্রাণ শীতল করা রৈ রৈ আওয়াজ তোলার' স্বভাব থাকায় সে তারস্বরে আর্তনাদ করে ওঠে। সবাই জমায়েত হয় উঠানে। মোদাব্বের নিজে গাছটি উপড়ে ফেলে না, অন্যদের উপড়ে ফেলতে বলে। কিন্তু 'গাছটি উপড়ানোর জন্যে কারো হাত এগিয়ে আসে না'। কেন? 'হিন্দুয়ানির চিহ্ন' হওয়া সত্ত্বেও তুলসীগাছটি যে 'অক্ষত দেহে' বিরাজ করতে থাকে তার কারণ খোলাসা করে বলা হয়নি, কিছু সম্ভাবনার আভাস

দেয়া হয়েছে মাত্র। এ গল্পের পাঠ-সম্ভাবনার বহুলতার প্রধান কারণ এই অনির্দিষ্টতা। অন্তত তিনটি কারণের আভাস আমরা চিহ্নিত করতে পারি :

এক. তুলসীপাতার রস সর্দি-কফে উপকারী বলে ওষধি হিসাবে তারা গাছটি রেখে দেয়। প্রস্তাবটি ইউনুসের, যার 'গতকাল থেকে (...) সর্দি সর্দি ভাব'।

এ কারণটি বস্তুসম্মত ও বাস্তবসম্মত। কিন্তু এটি বড়োজোর গৌণ কারণ হতে পারে। মুখ্য কারণ যে নয় তা নিশ্চিত করা হয়েছে গল্পের খানিক পরের অংশেই : 'ইউনুসের সর্দি-সর্দি ভাবটা পরদিন কেটে গিয়েছিল। তুলসীপাতার রসের প্রয়োজন হয় নাই তার'।

দুই. এ বাড়ির প্রাক্তন গৃহকর্ত্রীর সম্ভাব্য দুরবস্থা তাদের মনে মানবিক আবেগ জাগিয়েছিল। তার স্মৃতিবাহী তুলসীগাছটি সে কারণে উপড়ে ফেলা হয়নি।

এ কারণটি বেশ আকর্ষণীয়। অন্তত দুই অনুচ্ছেদের লম্বা বর্ণনায় এরকম একটা ভাব তৈরির চেষ্টা থাকায় কারণ হিসাবে এটি গুরুত্বের দাবিদার। কিন্তু নিশ্চিত কারণ বলে একে গ্রাহ্য করা চলে না। কারণ একটু পরেই ঠাট্টার ছলে বলা হয়েছে, সবার হয়ত গৃহকর্ত্রীর ছলছল চোখের কথা মনে পড়ে না। যেমন, 'একটু মৌলবী ধরনের মানুষ' এনায়েত সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হয়েছে : 'প্রতি সন্ধ্যায় গৃহকর্ত্রীর সজল চোখের দৃশ্যটি তার মনেও জাগে কী?'

আমরা আগেই দেখিয়েছি, 'গৃহকর্ত্রীর ছলছল চোখের' জন্য উদ্বেগকে তুলসীগাছের সাথে এদের আচরণের একমাত্র কারণ হিসাবে পাঠ করা যায় না। কারণ, দ্বিতীয়বার পুলিশ আসার পর এ আবেগ দ্বারা তারা আর চালিত হয়নি।

তিন. তুলসীগাছটি তাদের মধ্যে একধরনের অপরাধবোধ জাগিয়ে তুলেছিল। এ বাড়ির অতীত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অচেতন থেকেই তারা সহি-সালামতে দিন গুজরান করছিল। 'আচমকা ধরা পড়ে গিয়ে শুষ্কপ্রায় মৃতপ্রায় নগণ্য তুলসীগাছটি হঠাৎ সে-বাড়ির অন্দরের কথা প্রকাশ করেছে যেন'।

'সে-বাড়ির অন্দরের কথা' বাক্যাংশটি এতই অনির্দিষ্ট যে একে কারণ হিসাবে নির্দিষ্ট করলে অনির্দিষ্টতা মোটেই কমে না।

তারা উপরের তিনটির একটি-দুটি বা সব কটি কারণে বা এ তালিকার বাইরের কোনো কারণে তুলসীগাছকে অক্ষত থাকতে দেয়। কিন্তু 'হিন্দুয়ানীর চিহ্ন' উপড়ে ফেলতে না পারায় 'কর্তব্যের সম্মুখে পিছপা' হওয়ার একটা অপরাধবোধ তাদের পাকড়াও করে। সেদিন সন্ধ্যার তর্কে 'সাম্প্রদায়িকতা'ই হয়ে ওঠে প্রধান বিষয়বস্তু। তারা সকলেই একমত হয় যে, 'তাদের নীচতা হীনতা গোঁড়ামির জন্যই তো দেশটা ভাগ হল। তার সমর্থনে এবার হিন্দুদের অবিচার-অত্যাচারের অশেষ দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়'। এমনকি 'বামপন্থি' মকসুদের বিশ্বাসের কাঁটাও আজ 'সংশয়ে দুলে দুলে ডান দিকে হেলে থেমে যায়'। অবদমনজনিত বিকারের এক মোক্ষম দৃষ্টান্ত এটি। গল্পের ক্ষেত্রে কার্যকারিতার দিক থেকে অংশটি আমাদের নিশ্চিত করে যে, তুলসীগাছটিকে অক্ষত রাখা এদের জন্য কোনো স্বাভাবিক বা

সাধারণ ঘটনা নয় — যথেষ্ট মানসিক চাপ তৈরি হওয়ার মতো ব্যাপার। তবু তুলসীগাছটি টিকে যায়। কেবল টিকেই যায় না, যত্ন-আত্তিও পায়। যত্ন পেয়ে সতেজ হয়ে ওঠে। মোদাব্বেরের সন্দেহ থাকে না যে, 'তুলসীগাছটির যত্ন নিচ্ছে কেউ'। কে যত্ন নিচ্ছে? স্পষ্ট করে না বলে এমনভাবে ব্যাপারটা উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে মনে হয়, মোদাব্বের ছাড়া যে কেউ কাজটা করতে পারে। তাহলে এ ব্যাপারে মোদাব্বেরের অবস্থানটা কী? না, তার অবস্থান বিপরীত গোছের কিছু নয়। সে গাছটিকে হাতের কঞ্চি চালিয়ে কতল করতে চায়। কিন্তু কী এক অজ্ঞাত কারণে করে না, বা করতে পারে না।

তুলসীগাছের সাথে তাদের সামষ্টিক আচরণের এ ধারা বদলে যায় দ্বিতীয়বার পুলিশ আসার পর। 'গভর্নমেন্ট বাড়িটা রিকুইজিশন করেছে' — এরকম এক শক্ত আইনি ফেরকায় তারা বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়। আরো দিন দশেক তারা এ বাড়িতে ছিল। কিন্তু অন্তত দুবার পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, বাড়ি ছাড়ার আগে থেকেই — ঠিক যেদিন দ্বিতীয়বার পুলিশ এল সেদিন থেকেই — তুলসীগাছটির গোড়ায় কেউ পানি দেয়নি।

৪.২

দুবার পুলিশ আসার ব্যাপারটিকে গল্পে বেশ গুরুত্ব দিয়ে বড়ো পরিসরে উপস্থাপন করা হয়েছে। শুধু তাই নয়। দুই অংশের মধ্যে একই উপাদানের আমদানি করে বৈপরীত্যসূচক সমরূপতাও নির্মিত হয়েছে। যেমন, সাব-ইনস্পেক্টরের দ্বিতীয় বউয়ের সাথে কাদেরের আত্মীয়তার প্রসঙ্গ। প্রথমবার 'বাড়ি ছাড়তে হবে না' নিশ্চয়তায় তাদের আনন্দ-উল্লাসের যে সব বার্তা ধ্বনিত হয়েছে, তা আমরা বিস্তারিত শুনতে পেয়েছি; 'আবার বাড়ি ছাড়তে হবে' নিশ্চয়তায় তাদের মনোবেদনাজনিত যে সব স্তব্ধতা জন্মেছে, তার বার্তাও শুনেছি। এই দুই বিপরীত মনোভাবের কারণটিও সরল — অস্তিত্বসংকট। প্রথমবার সংকট কেটে যাওয়ায় জীবন সম্পর্কে আশাবাদী কিছু মানুষের প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। পরেরবার সংকট ঘনীভূত হওয়ায় আশাহীন হতাশাগ্রস্ত মানুষের প্রতিক্রিয়ার দেখা মিলেছে। পেয়ে হারানোর বেদনা অধিকতর প্রবল হওয়ারই কথা। যেহেতু তারা তুলসীগাছের যত্ন নেয়া বন্ধ করেছে হতাশ অবস্থায়, আর যত্ন নিয়েছে আশাবাদী মুহূর্তগুলোতে, তাই নিশ্চিত করে বলা যায়, যত্ন নেয়া এবং না নেয়া যথাক্রমে আশাবাদী ও হতাশ মনস্তত্ত্বেরই প্রকাশ। আর এ গল্পের প্রায় পুরাটা জুড়ে বৈপরীত্যসূচক এই কাঠামোটি নির্মিত হওয়ায় একে আমলে না এনে গল্পটির কোনো 'তাৎপর্যপূর্ণ' পাঠ সম্ভব নয়।

যেভাবেই সূত্রবদ্ধ বা চিহ্নিত করা হোক না কেন, কোনো টেক্সটের আরো অনেক সম্ভাব্য পাঠ থেকেই যায়। আমাদের উপরের আলোচনায় এ গল্পের অংশবিশেষ ও সমগ্রের যেসব সূত্রায়ণ করা হয়েছে, তার নিরিখে নিচে দুটি পাঠ-সম্ভাবনা হাজির করছি।

এক. জীবন সম্পর্কে আশাবাদী অবস্থায় তাদের মানবিক সুকুমার বৃত্তিগুলো তাজা হয়। তাদের উল্লাস-উজ্জীবন সঞ্চারিত হয় আশপাশেও। এ বাড়ির পুরানো গৃহকর্ত্রীর একটা স্পষ্ট কল্পনা কারো কারো মনে জেগে ওঠায় কৃতজ্ঞতা বা মানবিক আবেগবশত তুলসীগাছের গোড়ায় তাদের কেউ প্রতীকী ভালোবাসা অর্পণ করে। অন্যদের মধ্যে কল্পনাটা স্পষ্ট কোনো রূপ না পেলেও বিরোধ তৈরি হয় না। কারণ, বস্তুজাগতিক আনুকূল্য

তাদের সবার হৃদয়ের ঔদার্যের কারণ হয়। ফলে এমনকি সম্প্রদায়গত সংকীর্ণতা অতিক্রম করার ক্ষেত্রেও অনুপ্রেরণার অভাব হয় না। বিপরীতে, হতাশ একজন মানুষ তার চারপাশেও চারিয়ে দেয় হতাশা। অন্যের জন্য কাজ করার মানসিক ঔদার্য তার থাকে না। তার সেই মানসিক শুষ্কতার প্রকাশ ঘটে শুকিয়ে ওঠা তুলসীগাছে।

মানুষের এই যে মনস্তাত্ত্বিক উত্থান-পতন, তার গোড়া কিন্তু সংশ্লিষ্ট বাস্তবতায়। আর তুলসীগাছটি সেই মানসিক অবস্থার অসহায় শিকার হলেও মানুষই ঘটনাটির কর্তা, বিষয়টিও সম্পূর্ণভাবে মানবিক। একটি তুলসীগাছের কাহিনী বিশেষ সময় ও বাস্তবতার পটে মানুষকেন্দ্রিক বিশেষ পরিস্থিতিরই আলেখ্য।

দুই. মানুষ যখন অভাবিত প্রতিষ্ঠা লাভ করে, অনুকূল পরিস্থিতিতে অস্তিত্ব সম্পর্কে আশাবাদী হয়, তখন অজানা অস্তিত্বভীতিও তার সহচর হয়। এই ভীতি সম্ভাব্য সংকটের ভীতি। হারানোর ভয়। ভয়ের কারণ হয়ত খুব স্পষ্ট থাকে না; কিন্তু তাকে আমলে আনতে হয়। ওয়ালীউল্লাহর অপরাপর রচনা পরীক্ষা করে বলা যায়, ভয় — নানা কিসিমের অস্তিত্বভীতি — তাঁর রচনার অন্যতম কেন্দ্রীয় বিষয়।[৮]

'একটি তুলসীগাছের কাহিনী' গল্পে তুলসীগাছটি আবিষ্কৃত হওয়ার প্রাক্কালে মোদাব্বের-মতিন-ইউনুস-এনায়েতদের এ ধরনের অস্তিত্বভীতিতে আক্রান্ত থাকাই স্বাভাবিক। পাওয়া জিনিস হারানোর ভয় তো আছেই — যেমন থাকে অন্য সবারও; উপরি হিসাবে আছে অনিশ্চয়তাজনিত ভয়। তুলসীগাছটি — হিন্দুয়ানীর চিহ্ন, পূজার উপকরণ, মঙ্গলকারী ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগত কারণে — এই ভীতির আধার হয়েছে। গাছটির সাথে তাদের আচরণে যে দ্বিধা দেখি, তার উৎস ভীতি বলেই মনে হয়। দুটি অংশ পরীক্ষা করা যাক :

ক. গাছটি উপড়ানোর জন্যে কারো হাত এগিয়ে আসে না।
খ. মোদাব্বেরের হাতে তখন একটা কঞ্চি। সেটি শাঁ করে কচু-কাটার কায়দায় সে তুলসীগাছের ওপর দিয়ে চালিয়ে দেয়। কিন্তু ওপর দিয়েই। তুলসীগাছটি অক্ষত দেহেই থাকে।

প্রথম অংশের বাক্যটি নিয়ন্ত্রণ-নিরপেক্ষ দ্বিধার দৃষ্টান্ত। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কঞ্চিটি নিচে নেমে এসেছিল নিশ্চয় গাছকে কতল করার তাগিদেই। কিন্তু বিপরীত এক তাগিদ কঞ্চিকে চালিয়ে নেয় ওপর দিয়ে।

কী সেই দ্বিধা বা তাগিদের উৎস? আমরা আগেই বলেছি, কৃতজ্ঞতা বা মানবিক আবেগ হতে পারে। কিন্তু উপরের অংশদুটির ভঙ্গি দেখে মনে হয়, মানসিক ঔদার্যের তুলনায় ভীতির প্রকাশক হিসাবেই ভঙ্গিটি অধিক জুতসই। ভীতির কারণ আছে বৈকি! তাদের স্বাভাবিক কিন্তু অজানা অস্তিত্বভীতিকে একটা মূর্ত রূপ এনে দিয়েছে তুলসীগাছটি। যে বাড়িটা আগে 'বেওয়ারিশ *ঠেকেছিল*', সেই বাড়ির মূল ওয়ারিশরা তুলসীগাছের মধ্যে যেন একধরনের মূর্তি ধারণ করল। বাড়িতে থাকার আইনি বৈধতাকে ছাড়িয়ে প্রকৃত ওয়ারিশদের কল্পনা বড়ো হয়ে ওঠায় ভীতি তাদের আড়ষ্ট করল। তুলসীগাছের যত্ন নেয়া তাদের সেই ভীতির এক প্রতীকী নিরাকরণ।

অন্যভাবে দেখলে, স্বয়ং তুলসীগাছটিই ভীতির উৎস। যদি এই তুলসীগাছ মঙ্গল করার ক্ষমতা রাখেই — যেমন বিশ্বাস ছিল গৃহকর্ত্রীর — তাহলে অমঙ্গলের শক্তিসম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনাও তার মধ্যে থাকে। এই অমঙ্গলের আশঙ্কা কি তাদের মনে জেগেছিল? এ কারণেই কি তুলসীগাছটি উপড়ানোর জন্যে কারো হাত এগিয়ে আসে না, মোদাব্বেরের কঞ্চি চলে যায় উপর দিয়ে, কেউ গোপনে পানি দেয় গাছের গোড়ায়, আগাছা সাফ করে?

বাড়ি থেকে উচ্ছেদ হওয়ার পর এ ভীতি তাদের আর থাকে না। বাড়িটির সাথে মঙ্গল-অমঙ্গলের সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায়, অবলম্বন হারানোর মধ্য দিয়ে তারা মুক্ত হয় অস্তিত্বভীতি থেকে। যার কিছুই নাই, তার হারানোর ভয় থাকবে কেন? তখন তুলসীগাছ সব অর্থেই তাৎপর্যহীন হয়ে ওঠে — ভীতির চিহ্ন হিসাবেও, ভীতির উৎস হিসাবেও।

উপরে আশাবাদিতা ও হতাশাকে চাবি-ধারণা বানিয়ে যে দুটি পাঠ দেয়া হয়েছে, তার দুই ক্ষেত্রেই সব কজন মানুষকে একই মানসিক পরিস্থিতিতে ধরে নিতে হয়েছে। সময়ের প্রচণ্ড নিয়ন্ত্রণ ছাড়া এ অবস্থা অসম্ভব। তাছাড়া, বাড়ি-দখল এবং বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হওয়া — এ দুই ঘটনার অধীনেই মানুষগুলো নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। বিশেষ সময়ের বিশেষ বাস্তবতা বাদ দিলে এর কোনো মানে হয় না। এই দুই দিক থেকেই 'একটি তুলসীগাছের কাহিনী' সময়ের গল্পই বটে। বিশেষ সময়ের।

৫.১

এ লেখায় গল্প পাঠের ক্ষেত্রে যে ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে, তাকে শেষ বিচারে রক্ষণশীলই বলতে হবে। সীমিত হলেও এতে লেখকসত্তা বা লেখক-মানসের অংশগ্রহণ আছে; টেক্সটকে এবং টেক্সটের সামগ্রিকতাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। পাঠককে গুরুত্ব দিয়ে কিংবা টেক্সটের সামগ্রিকতার ধারণাকে নাকচ করে দিয়ে সাম্প্রতিক দশকগুলোতে সাহিত্যপাঠের যেসব প্রণালিপদ্ধতি বিকশিত হয়েছে, যেমন, বিনির্মাণবাদী সমালোচনা-পদ্ধতি, সেগুলোকে বিশেষ আমলে আনা হয়নি। ধরে নেয়া হয়েছে, কোনো সাহিত্যকর্মের একাধিক পাঠ থাকতে পারে, কিন্তু অসংখ্য বা যে-কোনো পাঠ নয়। সেক্ষেত্রে পদ্ধতিটি দাঁড়িয়েছে অনেকটা E. D. Hirsch-এর এই সিদ্ধান্তের মতো :

> There may be a number of different valid interpretations, but all of them must move within the 'system of typical expectations and probabilities' which the author's meaning permits. (ইগলটন ১৯৯৬ : ৫৮)

Hirsch-এর এই ভাষ্য মতে, বিভিন্ন পাঠক বিভিন্ন সময়ে একটি রচনার নানারকম পাঠে উপনীত হতে পারেন; কিন্তু একে রচনাটির 'তাৎপর্য' (significance) বলাই ভালো, অর্থ (meaning) নয়।

এ রচনায় বিশেষভাবে পরীক্ষিত হয়েছে ঢাকার সাহিত্য-সমালোচনার এক অরাজক পরিস্থিতি, যেখানে 'মত' দেয়ার বিশৃঙ্খলা আছে, কিন্তু বিশ্লেষণ অপ্রতুল, এবং মতকে টেক্সটের সাপেক্ষে প্রতিপন্ন করার শৃঙ্খলা দুর্লভ। সম্ভবত 'লেখক-মানস'-এর আগাম অনুমান এবং 'আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি'র বহিরাগত পটভূমিকে 'অতিরিক্ত'

মূল্য দেয়াই এই নৈরাজ্যের উৎস। পশ্চিমা সাহিত্য-সমালোচনার ধারা টেক্সটকেন্দ্রিক নিবিড় পাঠের এক দীর্ঘ ও ফলপ্রসূ পর্বের মধ্য দিয়ে যেভাবে টেক্সটকে অতিক্রম করেছে, সে রকম একটি প্রক্রিয়ার প্রয়োজন আমাদের সমালোচনা-সাহিত্যে এখনো ফুরায়নি।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. হায়াৎ মামুদ সম্পাদিত এবং প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর গল্পসমগ্র*-এর যে সংস্করণটি আমরা ব্যবহার করেছি, তাতে গল্পটির আয়তন ছয় পৃষ্ঠারও কম।

২. এ দিক থেকে ওয়ালীউল্লাহ্ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তো বটেই, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, তারাশঙ্কর বা বিভূতিভূষণ থেকেও স্বতন্ত্র। গল্প বলার চেয়ে থামিয়ে দেয়া বা গতি রোধ করাই যেন তাঁর অভিপ্রায়।

৩. পরিবর্তনটা হয়েছে প্রধানত পাঠকের ভূমিকা উত্তরোত্তর বেশি পরিমাণে স্বীকৃতি পাওয়ায়। 'Indeed one might very roughly periodize the history of modern literary theory in three stages : a preoccupation with the author (Romanticism and the nineteenth century); an exclusive concern with the text (New Criticism); and a marked shift of attention to the reader over recent years.' (ইগলটন ১৯৯৬ : ৬৪) এই পাঠকের বেশেই ক্রমে বহিস্থ উপাদান অপ্রতিরোধ্য বেগে জায়গা জুড়ে নিয়েছে পুরো পাঠ-প্রক্রিয়ায়।

৪. আমরা যে কটি সমালোচনা পরীক্ষা করেছি, তার প্রায় সব কটিতেই দেশবিভাগকে একটি অনভিপ্রেত ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত করে আলোচনা করা হয়েছে। সৈয়দ আবুল মকসুদ গল্পটিকে দেখেছেন 'সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক কারণে স্বদেশ-বিভক্তির করুণ পটভূমিতে (লেখা) একটি প্রতিনিধি-গল্প' হিসাবে। (সৈয়দ ১৯৮১ : ৬৯)

আবু জাফর লিখেছেন : 'ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করার পেছনে যে জটিল-কুটিল রাজনীতি সক্রিয়ভাবে কাজ করেছিল তার ইতিবৃত্ত অনেকেরই জানা আছে। ঐ-বিভাজন মুষ্টিমেয় একটি শ্রেণীর মানুষের জন্য অঢেল বিত্ত ও অপ্রতিহত ক্ষমতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করেছিল ঠিকই কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান নির্বিশেষে বৃহত্তর শ্রেণীর মানুষের জন্য বয়ে নিয়ে এসেছিল সীমাহীন দুঃখ ও বঞ্চনা। দেশ বিভাজনের প্রশ্নে এবং দেশ বিভক্তির ফলে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সুসম্পর্ক বিনষ্ট হয়েছে'। (মমতাজউদদীন ১৯৮৯ : ৯৯)

শওকত ওসমান লিখেছেন : 'পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃত্বের চেহারা ছিল ফিউডাল। তাদের জোর সমর্থক নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী মোল্লা-মৌলভী ইত্যাদি। ১৯৪৮ সালে লেখা এই গল্প যেন পাকিস্তানের গোটা ভবিষ্যতের ইশারা'। (উদ্ধৃত, সৈয়দ ১৯৮৩ : ৬৩)

সবচেয়ে দায়িত্বহীন মন্তব্য করেছেন তানভীর মোকাম্মেল। গল্পের বাক্য-বিশেষ বা বাক্যাংশ উদ্ধৃত করে নিজের মন্তব্য জুড়ে দিয়ে লিখেছেন : 'এরা পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখেছিল এই আশায় যে পাকিস্তান নামক অভয়ারণ্যটি তৈরি হলে... "তাদের জীবনে সবুজ তৃণ গজাবে, ধমনীতে সবল সতেজ রক্ত আসবে"।... (তানভীর ২০০০ : ১৮)

দেশবিভাগ সম্পর্কিত এ সব মত ও মন্তব্য বেশ প্রচলিত; তবে নিঃসন্দেহে এগুলোই এ সংক্রান্ত একমাত্র দৃষ্টিভঙ্গি নয়। এমনকি সম্ভবত খুব সার্বজনীন সিদ্ধান্তও নয়। কোনো পঠনে এগুলো শামিল হতে পারে দুভাবে : এক. টেক্সটের বিচার-বিশ্লেষণের মধ্যে নিজের মত ও মন্তব্যকে বৈধ প্রমাণ করে; দুই. বিনির্মাণবাদী পদ্ধতিতে খোদ টেক্সটকেই বিপন্ন করে তুলে। উপরের উদাহরণগুলোর ক্ষেত্রে এমনটা ঘটেনি। বরং মন্তব্যগুলো উড়ে এসে জুড়ে বসেছে, অনেকটা ঐ মৌলানাদের ব্যাখ্যার মতো, যাদের বিরুদ্ধে ধর্মগ্রন্থের অংশবিশেষ বেমওকা উদ্ধৃত করে ধর্মের অপব্যবহারের অভিযোগ তোলা হয়।

৫. উদাহরণস্বরূপ বলা যাক, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল হাশিম কিংবা মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাভিত্তিক বিখ্যাত সব রচনায় তো বটেই, এমনকি জয়া চ্যাটার্জীর একাডেমিক সন্ধর্ভেও (Bengal Divided) দেশবিভাগ সম্পর্কিত যে সব বয়ান পাওয়া যায়, তার সাথে এই প্রচলিত মতগুলোর কোনো সামঞ্জস্য নাই।

৬. এই প্রথম লেখনটি পুনঃমুদ্রিত হয়েছে আবদুল মান্নান সৈয়দের *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ* (আবদুল ২০০১) গ্রন্থে।

৭. পাঠের এই রীতি-পদ্ধতির মিল আছে New Criticism-এর সাথে। এমনকি Reception Theory-র প্রধান মডেলগুলোও একে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে। যেমন, Wolfgang Iser-এর The Act of Reading (১৯৭৮) সম্পর্কে টেরি ইগলটন লিখেছেন (ইগলটন ১৯৯৬) : To read at all, we need to be familiar with the literary techniques and conventions which a particular work deploys; we must have some grasp of its 'codes', by which is meant the rules which systematically govern the ways it produces its meanings. (p. ৬৭) আরো লিখেছেন : Iser's model of reading is fundamentally functionalist : the parts must be made to adapt coherently to the whole. (p. 70)

৮. তাঁর উপন্যাসে 'ভয়' ধারণাটির প্রাবল্য এবং ব্যবহারের ধরন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন সৈয়দ আকরম হোসেন। (সৈয়দ ১৯৯৭)

বইয়ের তালিকা

আবদুল মান্নান সৈয়দ ২০০১, *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ*, অবসর, ঢাকা।

ইগলটন, টেরি ১৯৯৬, *Literrary Theory, an introduction*, second edition, Blackwell publishers, USA.

জীনাত ইমতিয়াজ আলী ২০০১, *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ : জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা।

টাইসন, লোইস ২০০৬, (দ্বিতীয় সংস্করণ), *Critical Theory Today*, Routledge, Newyork.

ফুকো, মিশেল ১৯৮৪,"What is Enlightenment?", in Rabinow (P.), d., *The Foucault Reader*, New York, Pantheon Books.

মমতাজউদদীন আহমদ ১৯৮৯, (সম্পাদিত), *লালসালু এবং ওয়ালীউল্লাহ*, অনিন্দ্য প্রকাশন, ঢাকা।

সৈয়দ আকরম হোসেন ১৯৯৭, *প্রসঙ্গ : বাংলা কথাসাহিত্য*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ১৯৯৬, *গল্পসমগ্র*, হায়াৎ মামুদ সম্পাদিত, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা।

সৈয়দ আবুল মকসুদ ১৯৮১, *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর জীবন ও সাহিত্য*, প্রথম খণ্ড, মিনার্ভা বুকস, ঢাকা।

সৈয়দ আবুল মকসুদ ১৯৮৩, *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর জীবন ও সাহিত্য*, দ্বিতীয় খণ্ড, মিনার্ভা বুকস, ঢাকা।